প্রথাগত ভূমি অধিকার, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি

মঙ্গল কুমার চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলন, খাগড়াছড়ি জেলা হেডম্যান এসোসিয়েশন ও কাপেং ফাউন্ডেশন
৩১ অক্টোবর ২০১০, ভিআইপি লাউঞ্জ, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা।

১. আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী বিষয়ক ১৬৯ নং কনভেনশন মতে, ভূমি বলতে ভূখণ্ড ও জলাশয়ের ধারণা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ভোগদখলে থাকা বা অন্যভাবে ব্যবহৃত এলাকার সামগ্রিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অপরদিকে আইএলও'র ১৯৫৭ সালের আদিবাসী ও জনজাতি বিষয়ক কনভেনশন (কনভেনশন নং ১০৭) অনুস্বাক্ষর করেছে। উক্ত কনভেনশনের ১১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, "সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্যদের ঐতিহ্যগতভাবে অধিকৃত ভূমির উপর যৌথ কিংবা ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করতে হবে।" আদিবাসীদের চিরাচরিত বা প্রথাগত ভূমি অধিকারের মূল ভিত্তি হচ্ছে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর যৌথ বা সমষ্টিগত মালিকানা। রাষ্ট্র আইএলও'র ১০৭নং কনভেনশন অনুস্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের চিরাচরিত বা প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে।

বলাবাহুল্য, আদিবাসীদের জীবন, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার সাথে জমি-জঙ্গল-জলের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। বিশ্বের দেশে দেশে আদিবাসীরা ভূমিকে পবিত্র হিসেবে গণ্য করে। ভূমিভিত্তিক সম্পদ- প্রকৃতি, জল, বন ও বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, পশু-পাখী সবকিছু পবিত্র হিসেবে জ্ঞান করে থাকে। কেবল নিজেদের স্বার্থে নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থেও তারা তা মনে করে। ভূমির সাথে এই সম্পর্কের কারণে তাদের ঐতিহ্যগত ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা স্থায়ীত্বশীল পবিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়ক হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ভূমি, বন ও পাহাড়কে আদিবাসীরা সমষ্টিগত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। তাই ঐতিহ্য অনুসারে সরকারীভাবে রেজিষ্ট্রেশনের ধারণা তাদের কাছে গৌণ, যা দেশে প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে বিরোধাত্মক। ভূমির উপর আদিবাসীদের এই সমষ্টিগত অধিকারকে উপেক্ষা ও ক্ষুন্ন করার ফলে আদিবাসীরা ক্রমাগতভাবে তাদের চিরায়ত ভূমি, বন ও পাহাড় থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। তাদের জমি, বন ও পাহাড় হারানোর ফলে আদিবাসীদের মধ্যে দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে। তাদের স্বাধীন ও পূর্বাবহিত পূর্বক সম্মতি ব্যতীত তাদের ভূমি ও ভূখণ্ডে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা, অস্থানীয়দের অভিভাসন, নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে তারা তাদের ভূমি, বন ও পাহাড় বেহাত হয়ে যাচ্ছে।

১.১ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকার

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের ক্ষেত্রে অন্যান্যের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আইন হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯০০ (১৯০০ সালের ১নং আইন)। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ৪১ ও ৪২ নং বিধিতে জুমচাষ সম্পর্কে এবং ৪৩ নং বিধিতে সার্কেল চীফ ও মৌজার হেডম্যানের জমির খাজানা আদায় ও মওকুফের বিধান বিবৃত হয়েছে। এ সব বিধি বলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীনে বন্দোবস্তকৃত বা অধিগ্রহণকৃত ভূমি ব্যতীত অন্য সকল ভূমির উপর মৌজার অধিবাসীদের ঐতিহ্যগত মালিকানা স্বত্ব বহাল থাকে। স্বাভাবিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন ভূমি ব্যক্তি মালিকানাধীনে বন্দোবস্তকৃত না হয়ে থাকলেও মৌজায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত কোন ব্যক্তি কর্তৃক দখল বা চাষাবাদ করা হয়ে থাকলে তাকে উক্ত জমির দখলকার বা চাষাবাদকারী হিসেবে প্রচলিত রীতিতে উক্ত ভূমির মালিক হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রথাগত আইনগলো লিখিত আইন বা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে স্বীকৃত হয়েছে অথবা লিখিত আইনে পরিণত হয়েছে। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে বসতবাড়ি, ভূমি এবং বন সম্পদের উপর আদিবাসী জনগণের অধিকার। তবে বন এলাকা এবং পার্বত্য এলাকায় বাকি অংশে অধিকাংশ প্রথাগত ভূমি অধিকার অস্বীকৃতই রয়ে গেছে।

কোনো মৌজার অন্তর্ভূক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের পূর্বে সংশ্লিষ্ট হেডম্যানের পরামর্শ নেওয়ার বিধানটি উক্ত মৌজার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আদিবাসী জনগণের আধিকারের পরোক্ষ স্বীকৃতি বলেই ধরে নেয়া যায়। প্রত্যন্ত এলাকায় অধিবাসী, বিশেষ করে মৌজার হেডম্যান এবং কার্বারী, এ ধরনের প্রথা ও রীতি চর্চা করে আসছে। কিন্তু সরকারী বিধি, নীতি-নির্দেশনা, আদালতের

রায় কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক আইনি নির্দেশের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রথাগত অধিকারের বিষয়গুলো এখনও বিশদভাবে বর্ণিত হয়নি। ফলে এ সকল অধিকারসমূহের আইনী মর্যাদার ব্যাপারটি এখনও অমীমাংসিত রয়েছে।

পার্বত্যাঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা বরাবরই দেশের অপরাপর সমতল অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা হতে পৃথক। অনুরূপভাবে এ অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থাপনাও সমতল জেলাগুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। পার্বত্য চট্টগ্রামে মূলতঃ তিন ধরনের ভূমি রয়েছে। প্রথমতঃ বন্দোবস্ত কৃত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভূমি যা বেশীর ভাগই ধান্য জমি। দ্বিতীয়তঃ ভোগদখলীয় জমি যা বেশীর ভাগই বাস্তুভিটা, বাগানবাগিচা ইত্যাদির ভূমি। তৃতীয়তঃ রেকর্ডীয় বা ভোগদখলীয় কোনটাই নয় এমন ভূমি যা জুমভূমি নামে খ্যাত ও প্রথাগতভাবে সংশ্লিষ্ট মৌজা অধিবাসীদের সমষ্টিগত মালিকানাধীন। অর্থাৎ মৌজা এলাকায় অবস্থিত ভূমির মধ্যে ব্যক্তি নামে বন্দোবস্তকৃত বা ভোগদখলীয় ভূমি ব্যতীত অন্য সকল ভূমিই মৌজাবাসীর। রাজা-হেডম্যান-কার্বারীর নিয়ে গঠিত প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এসব ভূমি ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই মৌজার অধিবাসী যে কোন ব্যক্তি হেডম্যানের অনুমতি নিয়ে মৌজাস্থিত সমষ্টিগত মালিকানাধীন জমিতে জুম চাষ, গো-চারণ, গৃহস্থালী কাজে বনজ দ্রব্যাদি সংগ্রহ ইত্যাদির অধিকার রয়েছে। এজন্য জুমচাষীরা পরিবার ভিত্তিক জুম খাজনাও দিয়ে থাকে। জুমভূমি সমষ্টিগত মালিকানাধীন বিধায় জুম খাজনা জমি ভিত্তিক না হয়ে, মূলতঃ মাথাপিছু ভিত্তিক ক্যাপিটাশন ট্যাক্স হিসেবে ধার্য হয়ে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনা মূলতঃ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ১৯৯৮ সালের তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন (সংশোধন), ১৯৯৮ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৩৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম বাজারফান্ড বিধিমালা প্রভৃতি বিশেষ আইন ও বিধিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অধিকন্তু এই অঞ্চলে রয়েছে রাজা-হেডম্যান-কার্বারীদের নিয়ে ঐতিহ্যবাহী প্রশাসন ব্যবস্থা যারা সরাসরি ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যাকে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে কয়েকটি বিশেষ মৌলিক বিধান রাখা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি ভূমি কমিশন গঠন করে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার বিধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, উক্ত কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুসারে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান করা হয়েছে।

আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১" প্রণীত হয়। কিন্তু উক্ত আইনে চুক্তির সাথে অনেক বিরোধাত্মক ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা আজও সংশোধিত হয়নি। তাই ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে। ভূমি কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার বিষয়টি এখনো চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে বিরাজ করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্যে নিহিত রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি। অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর এক যুগের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও ভূমি বিরোধ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধানাবলী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তেমন কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আগে যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলে পূর্বের মতো পাহাড়ীদের তাদের চিরায়ত জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ করে ভূমি জবরদখল, সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিতকরণ, নানা অজুহাতে বা নানা প্রকল্পের নামে অধিগ্রহণ, আইন লঙ্ঘন করে অস্থানীয়দের নিকট অব্যাহতভাবে ইজারা প্রদান ইত্যাদির ফলে একদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি সমস্যা আরো বেশী জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে আদিবাসী পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত ভূমি অধিকার পদলিত হয়ে চলেছে।

১.২ সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি অধিকার ও ভূমি সমস্যা

তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর স্থানীয় আদিবাসী জাতিসমূহের ভূমি ও শাসনের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৮৭০ সালে "ভারত শাসন (পশ্চাদপদ অঞ্চল শাসনের জন্য) আইন, ১৮৭০" প্রবর্তন করে এবং এর অধীনে "ইনার লাইন রেগুলেশন, ১৮৭৩" ও "তফসিলভুক্ত জেলা আইন, ১৮৭৪" প্রণয়ন করে যথাক্রমে বহিরাগতদের প্রবেশের উপর বাধা-নিষেধ এবং ভূমি ও শাসন সংক্রান্ত অধিকারের নিরাপত্তা বিধান করে। উক্ত তফসিলভুক্ত জেলা আইন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আসামসহ (১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও বৃহত্তর সিলেট আসামের অন্তর্গত ছিল) ৩৫টি অঞ্চল বা পরগণা তফসিলভুক্ত জেলা হিসেবে তালিকাভুক্ত ছিল।

১৮৮৫ সালে "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৮৮৫" প্রণীত হয় ও জমিদারদের উপর ভূমির মালিকানাস্বত্ব দেওয়া হয়। তবে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে চাষীদেরকে জমির ব্যক্তি মালিকানাস্বত্ব প্রদানের ব্যবস্থা কার্যকর করা শুরু হয়। এতে ভূমির উপর সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আদিবাসীদের সমষ্টিগত মালিকানাস্বত্ব বা প্রথাগত অধিকার খর্ব হতে থাকে।

ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পর ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সালের আইন নং ২৮)' প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনে জেলার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিত আদিবাসীদের জায়গা-জমি অআদিবাসী বা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর

নিকট হস্তান্তরে বাধানিষেধ রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে প্রথম তফসিলে বর্ণিত প্রচলিত আইন হিসেবে সরাসরি এই আইনটি বহাল রাখা হয়েছে।

তবে সমতলের সকল অঞ্চলে এই আইনটি সমানভাবে প্রয়োগ হয় না। পূর্বেকার 'আংশিক শাসন বহির্ভূত এলাকা' বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার অঞ্চল ব্যতীত, অন্যান্য অঞ্চলে এই আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয় না বলে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। ময়মনসিংহে জেলা প্রশাসন ও ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের (আদিবাসীদের একটি প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন) মধ্যে ব্রিটিশ আমল থেকে প্রচলিত একটি সমঝোতা রয়েছে যে, জেলা প্রশাসন উক্ত সংগঠনের সাথে প্রাথমিক পরামর্শ ছাড়া মান্ডি (গারো) ও অন্যান্য আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভূমি হস্তান্তর অনুমোদন করে না। দিনাজপুর জেলায় কিছুটা কম মাত্রায় এ রকম পরামর্শ প্রচলন রয়েছে, তবে রাজশাহীর বিভাগের অন্যান্য এলাকায় এর প্রচলন দেখা যায় না।

বরিশাল বিভাগের অন্তর্গত দক্ষিণ-মধ্যবর্তী পটুয়াখালি-বরগুনা অঞ্চলে বসবাসরত রাখাইনদের মধ্যে ভূমি হারানোর পরিস্থিতি বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। ব্রিটিশ শাসনামলে ও এমনকি পাকিস্তানের শাসনামলের গোড়ার দিকে, 'ওয়েলফেয়ার অফিসার' নামে বিশেষ কর্মকর্তারা ময়মনসিংহ ও পটুয়াখালি-বরগুনা অঞ্চলসহ সমতলে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার জন্য বিশেষ দায়িত্ব পালন করতো, কিন্তু এসব অঞ্চলে এখন আর সেই রকম অফিস নেই। এই অফিসের মতো দিনাজপুর জেলায় এখনও 'ওয়েলফেয়ার অফিসার' এর অফিস রয়েছে, তবে উক্ত অফিস স্থানীয় আদিবাসীদের কল্যাণে এখন খুব সামান্যই কাজ করছে বা তেমন কোন কিছু করছে না।

১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনকে লঙ্ঘন করে দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের যোগসাজসে অসাধু উপায়ে সমতল অঞ্চলে আদিবাসীদের জমিজমা অআদিবাসীদের নিকট হস্তান্তরিত হচ্ছে। ইকো-পার্ক, জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, কয়লা-তেল-গ্যাস উত্তোলনের নামে চিরায়ত জমিজমা থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর একটি ভূমিগ্রাসী প্রভাবশালী গোষ্ঠী আদিবাসীদের জমি ছলে-বলে-কৌশলে জবরদখল করে চলছে। প্রশাসনের দারস্থ হলেও তার কোন প্রতিবিধান পাওয়া যায় না। প্রশাসন তথা রাষ্ট্র আদিবাসীদের ভূমি সংরক্ষণে এগিয়ে আসে না বললেই চলে।

সমতল অঞ্চলে প্রভাবশালী ও অসাধু ভূমি দখলদাররা আরেকটি আইন হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তা হচ্ছে 'অর্পিত ও অনাবাসী সম্পত্তি (প্রশাসন) আইন, ১৯৭৪। এই আইনটি ১৯৬৫ সালে তৈরীকৃত বিভিন্ন আইনের সমন্বয়ে প্রণীত হয় ১৯৬৫ সালে তৎকালীন পাকিস্তান ও ভারতের যুদ্ধের সময় যেসব লোক ভারতে চলে যায়, তাদের সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য। ১৯৭৪ সালের এই আইনটি এলোপাতাড়ীভাবে, অন্যান্যদের মধ্যে, বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম রাজশাহী বিভাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও উত্তর-মধ্যবর্তী দেশের গারো জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবহার হয়। আদিবাসীদের যেসব জমি অর্পিত সম্পত্তি আইনের মাধ্যমে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে, সেসব জমি প্রত্যর্পণের দাবী জানিয়ে আসছে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ।

আরেকটি আইন হচ্ছে ১৯২৭ সালের বন আইন (১৯২৭ সালের ১৬ নং আইন) যা বনাঞ্চল এবং বনজ সম্পদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা করে। এই আইনের বিভিন্ন ধারা, বিশেষ করে ২৮ নং ধারা, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রথাগত ভূমি অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এই আইনের ২৮(১) ধারায় যে কোন গ্রামের জনগোষ্ঠীকে সরকারী ক্ষমতা অর্পণ করতে অথবা যেসব ভূমি সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করেছে সেসব ভূমি হস্তান্তর করতে সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

সমতল অঞ্চলের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট বিভাগ, উত্তর-মধ্যবর্তী অঞ্চলের বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বাস করে, তাই তাদের অধিকার বিষয়ে এই বিধানের যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। সিলেট বিভাগের কিছু অংশে খাসি আদিবাসীরা স্বল্পমেয়াদী লিখিত চুক্তির মাধ্যমে সংরক্ষিত বনভূমি ব্যবহার করে আসছে, কিন্তু মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর অনেক ক্ষেত্রে এসব ইজারা নবায়ন করা হয় না। তবে অন্যান্য অঞ্চলে এধরনের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই এসব অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও জীবনযাত্রা অনেকটা অনিশ্চিত।

২. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের পর দীর্ঘ সংলাপের মাধ্যমে সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি (পাহাড়ী) অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকার করে এই অঞ্চলের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা, পাহাড়ী জনগণের প্রথাগত ভূমি অধিকারকে স্বীকার করে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা, সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা, প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা, এই অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় গঠন করার বিধান করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরে তৎকালীন সরকার কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কতিপয় আইন প্রণয়নসহ কিছু বিষয় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে এ চুক্তি বাস্তবায়নের মৌলিক ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছে। এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপন, ভারত থেকে পাহাড়ী শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্যতম।

তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো- যেগুলোর উপর পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি করে ভূমি অধিকার প্রতিষ্ঠা, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন কার্যকর করে অত্রাঞ্চালে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করার মতো মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন নির্ভর করে সেসব মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নে তৎকালীন সরকার এগিয়ে আসেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণীত হলেও এসব এখনো যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়নি, ফলে বিশেষ শাসনব্যবস্থার এখনো কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি; এখনো সশস্ত্রবাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়নি, এমনকি পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহারের সময়সীমাও নির্ধারণ করা হয়নি, পক্ষান্তরে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে একপ্রকার সেনা কর্তৃত্ব জারী করা হয়; ভূমি কমিশন গঠিত হলেও ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির কাজ শুরু হয়নি এবং ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন প্রণীত হলেও পার্বত্য চুক্তির সাথে ১৯টি বিরোধাত্মক বিষয় সন্নিবেশ করা হয়; ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ী শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা হয়নি, পক্ষান্তরে চুক্তিকে লঙ্ঘন করে সেটেলার বাঙালীদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়; সার্কেল চীফের মাধ্যমে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান বিধান কার্যকর করা হয়, তবে চুক্তি লঙ্ঘন করে জেলা প্রশাসককে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়; অস্থানীয়দের নিকট দেয়া ভূমি লীজ বাতিল করা হয়নি, পক্ষান্তরে চুক্তি লঙ্ঘন করে নতুন লীজ প্রদান করা হয়; স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভোটার তালিকা প্রণীত হয়নি, পক্ষান্তরে চুক্তি পরবর্তী সময়ে প্রণীত ভোটার তালিকায় বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়; পার্বত্যাঞ্চলের সকল চাকুরীতে পাহাড়ীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ করার বিধান কার্যকর হয়নি ইত্যাদি বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইতিমধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারের উল্লেখিত পদক্ষেপ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বলা যায়। তবে এগুলো মূলত কিছু কমিটি পুনর্গঠন ও পদে নিয়োগদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলা যায়। চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলোর প্রায়োগিক বাস্ত বায়ন এখনো শুরু হয়নি। সরকার বিগত প্রায় দু বছরেও এসব মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এর ফলে জুম্ম জনগণসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীরা বর্তমান সরকারের উপর দিন দিন আস্থা হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে। বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা জিইয়ে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থে কখনোই মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না।

রাষ্ট্রনায়কোচিত যে সাহসিকতায় ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেই একই রকম বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সরকারের মূল নীতি নির্ধারকদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে আসতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা, গণমুখী ও পরিবশমুখী সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে অন্য কোন বিকল্প নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এখনই উপযুক্ত সময়। তাই সরকারের তরফ থেকে বাস্তবায়নের রোডম্যাপ ঘোষণা পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যক। সে সাথে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহায়তা চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

৩. আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক তৎকালীন সামরিক শাসনামলের আইনের বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত পঞ্চম সংশোধনী আইনকে সংবিধান বহির্ভূত ও বেআইনী মর্মে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। উক্ত রায়ে যথাযথ আইনী পদক্ষেপের মাধ্যমে '৭২-এর সংবিধানের মূলস্তম্ভসমূহ পুনর্বহাল করারও নির্দেশ রয়েছে। উক্ত ঐতিহাসিক রায়ের আলোকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার দেশের সংবিধান সংশোধন বা '৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। বলাবাহুল্য, '৭২ সালের সংবিধান তুলনামূলকভাবে গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক হলেও এতে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। অপরদিকে বর্তমান সরকারের সংবিধান সংশোধনের এই মহান উদ্যোগের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতির উপযুক্ত ক্ষেত্র ও সুযোগ তৈরী হয়েছে।

বলাবাহুল্য, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথার্থ নাগরিক মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারে না। তারা আগ্রাসন, আক্রমণ ও উচ্ছেদের কারণে জমি থেকে উৎখাত হয়ে পড়ছে এবং নিজ ভূমিতে পরবাসী জীবনযাপন করছে। অথচ দেশের আদিবাসী জনগণ উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে। কিন্তু তাদের স্বশাসনসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক,

সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকারগুলো এখনো সাংবিধানিকভাবে অস্বীকৃত রয়ে গেছে। তবে সংবিধানের ২৮(৪) ও ২৯(৩) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত "নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ" হিসেবে বিবেচনা করে সরকার আদিবাসীদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন বা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। কিন্তু সংবিধানের উক্ত "নাগরিকদের অনগ্রসর অংশ" প্রত্যয়টি অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং এর মাধ্যমে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি পরিপূরণ হয় না। আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকার কারণে সকল ক্ষেত্রে তারা নানা উপেক্ষা ও প্রান্তিকতার শিকার হয়ে আসছে।

আদিবাসী জাতিসমূহের স্বাতন্ত্র্য ও প্রান্তিকতার আলোকে আদিবাসীদের জাতিগত পরিচিতি ও স্বকীয়তা, স্বশাসন বা বিশেষ শাসন, সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব এবং সর্বোপরি সমঅধিকার ও সমমর্যাদার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ সংক্রান্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকার সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সন্নিবেশ করা অপরিহার্য। এর মধ্যে অন্যতম হলো-

(১) সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ৪৬টির অধিক আদিবাসী জাতিসমূহের জাতিগত ও সংস্কৃতিগত পরিচিতি এবং স্বকীয়তাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসিত আদিবাসী অঞ্চলের মর্যাদা সাংবিধানিকভাবে প্রদান করা। এলক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' এবং এই চুক্তির অধীনে প্রণীত আইনসমূহকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা।

(৩) দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত/বসবাসরত অঞ্চলগুলোতে আদিবাসী নারীসহ আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার পরিষদে আসন সংরক্ষণ করা।

(৪) আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক ও আইনী রক্ষাকবচ যাতে আদিবাসী জাতিসমূহের সম্মতি ছাড়া সংশোধন বা বাতিল করা না হয় তার সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদান করা।

(৫) আদিবাসীদের প্রথাগত অধিকারসহ ভূমি, ভূখন্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আদিবাসীদের অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা।

(৬) বৈষম্য দূরীকরণ এবং সমঅধিকার ও সমমর্যাদা লাভের লক্ষ্যে আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের বিধান করা।

উপরোক্ত প্রস্তাবাবলী গৃহীত হলে দেশের আদিবাসী জনগণের প্রতি বৈষম্য দূরীভূতকরণের একটি কার্যকর ভিত্তি স্থাপিত হবে এবং ভিন্ন ভিন্ন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী তাদের পরিচয় ও স্বকীয়তা বজায় রেখে দেশের নাগরিক হিসেবে মূলস্রোতধারার কর্মকান্ডে যথাযথভাবে অংশগ্রহণের সমসুযোগ পাবে।

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহকে 'আদিবাসী' হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী হবে এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র উন্মোচিত হবে বলে নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিশেষ সংরক্ষণমূলক সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সমুন্নত ও রক্ষিত হবে। এতে করে এদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা ও নৃতাত্ত্বিক বহুমাত্রিকতা অধিকতর সমৃদ্ধশালী হবে।#